ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রশ্নোত্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ

১. জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ শীর্ষক গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ শীর্ষক গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের দুর্বলতা ও সবলতার মাত্রা নির্ধারণ করে একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরা যেন দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এই প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও বেশি ও কার্যকর অবদান রাখতে পারে। এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হল;

- দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত সক্রিয় কর্মী ও অন্যান্যদের মাঝে বাংলাদেশ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার সবলতা ও দুর্বলতার বিষয়গুলো গভীরভাবে তুলে ধরা;
- জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার আওতায় অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নির্দেশকরণে দুর্নীতি বিরোধী অংশীজনদের মাঝে জাগরণ তৈরি করা

২. কাদের অর্থায়নে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে?

অস্ট্রেলিয়ার AusAID এর সহায়তায় এবং বার্লিন ভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

৩. একই ধরনের এই গবেষণা অন্যান্য কোন কোন দেশে পরিচালিত হয়েছে?

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় অনুরূপ গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া ইউরোপ, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে বা হচ্ছে।

৪. জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো কি কি?

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ১৫টি প্রতিষ্ঠান হল: সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পুলিশ (আইন প্রয়োগকারী সংস্থা), মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যবসায় খাত।

৫. কোন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে?

এটি একটি গুণগত গবেষণা যেখানে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উভয় ধরণের তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য ও উপাত্তের মধ্যে রয়েছে জাতীয় আইন,

গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন। জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে তার সক্ষমতা, সুশাসন এবং ভূমিকার আলোকে এই প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমীক্ষার সময়ে আইন ও অনুশীলনের মধ্যকার দূরত্বকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আইন এবং প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিক চর্চাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গুনগত এই গবেষণাটি পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যের উপর নির্ভরতা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট আইনের ও গবেষণার পর্যালোচনা, গণমাধ্যম ও অন্যান্য সূত্রের প্রতিবেদন পর্যালোচনা, মুখ্য তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাতকার, আইনী যাচাই এবং আট সদস্যবিশিষ্ট এক উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক মান যাচাইকরণের পরই তা প্রকাশ করা হয়েছে।

৬. গবেষণার বিশেষজ্ঞ কমিটিতে কারা জড়িত ছিলেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান এবং আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এই গবেষণাটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন। উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন: ড. কামাল হোসেন , সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, আরলিঙ্কস গ্রুপের চেয়ারম্যান রোকেয়া আফজাল রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এ এস এম শাজাহান, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. দিলারা চৌধুরী, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স স্টাডিজের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মঞ্জুর হাসান, ওবিই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক সি আর আবরার।

৭. গবেষণায় সামরিক বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি কেন?

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সীমিত। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিষয়টি জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অংশ নয়। পক্ষান্তরে গবেষণায় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সমূহ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। তাই এই গবেষণায় সামরিক বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী নিয়ে টিআইবি ইতোমধ্যে গবেষণা করেছে।

৮. অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নাগরিক সমাজের সাফল্যকে বড় করে দেখার কারণ কি?

বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের কোন একক ও সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব না থাকলেও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজের শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। দেশে যখনই কোন সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, নাগরিক সমাজ তখন সংকট সমাধানে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছে, প্রয়োজনবোধে নেতৃত্বও দিয়েছে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নাগরিক সমাজ বিভিন্ন সময়ে সরাসরি অবদান রেখেছে এবং এখনো রাখছে। একটি সুসংহত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জন-দাবীর সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধের চর্চা এবং সমান সুযোগের নীতি বজায় রাখতে সুশাসন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টিতে নাগরিক সমাজের অবদানের কোন বিকল্প নেই।